শেখ মোহাম্মদ আসলামে: বাংলাদেশ ফুটবলের সোনালি অতীত

ইমদাদ ইসলাম

বর্তমান তরুণ প্রজন্মের কাছে যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের কয়জনের নাম তারা বলতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েই যায়। অথচ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ফুটবলই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। এমন একজন ছেলেও পাওয়া যেত না, যে জীবনে ফুটবল খেলেনি। আমাদের ফুটবলারদের ক্রীড়া নৈপুণ্য মানুষ হৃদয় দিয়ে উপভোগ করত। কিন্তু দেশীয় ফুটবলে এখন সেই জনপ্রিয়তা আর নেই। এই পতনের জন্য দায়ী আমাদের নিম্নমানের ফুটবল। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ফুটবলের সেই স্বর্ণযুগের সূর্য আজ প্রায় অস্তমিত।

স্বাধীনতা-উত্তর ফুটবলে আমাদের খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তা ছড়িয়েছিল আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। সেই সময় মারদেকা কাপ, প্রীতি ম্যাচ কিংবা এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে আমাদের ফুটবলাররা নিয়মিত পারফর্ম করতেন। আবাহনী, মোহামেডান কিংবা ব্রাদার্স ইউনিয়নের মতো ক্লাবগুলো মাঠে লাখো দর্শকের ভিড় টানত। ফুটবল মাঠ ছিল শুধু খেলার জায়গা নয়, বরং জাতির আবেগ, উচ্ছ্বাস আর একতার প্রতীক।

দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইন, মালদ্বীপ, ভুটান, এমনকি আর্জেন্টিনা একাদশের বিরুদ্ধেও গোল আছে আমাদের দেশেরই এক কৃতি ফুটবলারের। বর্তমান প্রজন্ম কি তাকে চেনে? ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ২৭তম মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় আর্জেন্টিনা একাদশের বিরুদ্ধে গোল করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ ফুটবলার। যদিও সেই খেলায় বাংলাদেশ ৫-২ গোলে হেরেছিল। সেই ফুটবলার হলেন শেখ মোহাম্মদ আসলাম, যাকে দেশবাসী স্ট্রাইকার আসলাম বা আবাহনীর আসলাম নামেই চেনে।

তিনি তার ৭ ভাই-বোনের মধ্যে ষষ্ঠ। ছোটবেলায় ফুটবলের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল । গাছের গাব চুরির টাকা দিয়ে প্রথম বল কিনেছিলেন। তার বড়ো মামা ফুটবলার ওয়াসিফুর রহমান কিশোর আসলামের ফুটবল প্রতিভা দেখে অবাক হয়ে ছিলেন। তাই তিনি নিজের বোন অর্থাৎ আসলামের আম্মার বিরোধীতা সত্ত্বেও ভাগ্নে আসলামকে ফুটবল খেলায় আগ্রহী করে তুলেন। যদিও ফুটবল খেলার বিষয়ে আসলামের বাবার সব সময় সম্মতি ছিলো। আসলাম পল্লী মঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি ক্লাস এইটে পড়ার সময় আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে লংজাম্পে দ্বিতীয়, জ্যাভেলিনে ও শুটপুটে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

১৯৭৭-৭৮ মৌসুমে, ভিক্টোরিয়া ক্লাবের হয়ে খেলার মাধ্যমে তিনি তার জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের খেলোয়িাড়ি জীবন শুরু করেছিলেন। যদিও আসলাম ক্লাবে একজন ডিফেন্ডার হিসাবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন, ভিক্টোরিয়ার ততকালীন বুদ্ধিমান কোচ আব্দুর রহিম তার মধ্যে একজন স্ট্রাইকারের সম্ভাবনা দেখেছিলেন এবং ১৯৭৯ সালে তার অবস্থান পরিবর্তন করে তাকে স্টাইকার হিসেবে খেলান। যেখানে তিনি ৩ মৌসুম অতিবাহিত করে ১৯৮০–৮১ মৌসুমে বিজেএমসি তে যোগদান করেন। বিজেএমসি তে যোগ দেওয়ার আগে ভিক্টোরিয়ার হয়ে তিনি ১৪টি গোল করেছিলেন। ১৯৭৯ সালে, বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব -১৯ দলে আসলামের অভিষেক হয় । প্রায় ৩ বছর বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক দলে খেলার পর, ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের হয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিষেক হয়েছিলো। ঐ বছরই ঢাকায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় প্রেসিডেন্ট কাপ ফুটবলে বাংলাদেশ লাল দলের হয়ে তিনি দুর্দান্ত খেলেন তিনি । প্রতিদন্ধী দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একটি এবং নেপালের সঙ্গে একটি গোল করেন। আসলাম তার অভিষেক বছরেই বিজেএমসির হয়ে ১৩ গোল করে লাইমলাইটে এসেছিলেন এবং ১৯৮১ সালে বিজেএমসির অধিনায়ক হয়ে ছিলেন। বিজেএমসিতে তিন মৌসুম অতিবাহিত করার পর ঢাকা মোহামেডানের চলে আসেন, যেখানে তিনি ১৪টি গোল করেন। ইনজুরিতে আক্রান্ত হওয়ার পর ১৯৮৪–৮৫ মৌসুমে, ঢাকা মোহামেডান হতে ঢাকা আবাহনীতে যোগদান করেন এবং একাধারে ১০ মৌসুম খেলেন।আর এর মাধ্যমেই তিনি হয়ে ওঠেন আবাহনীর ঘরের ছেলে আসলাম। ১৯৮৪ সালে নয়াদিল্লিতে ডিসিএম ট্রফিতে আবাহনী ভারতের গুর্খা ব্রিগেডকে ৪-১ গোলে এবং মালদ্বীপের ভ্যালেন্সিয়া ক্লাবকে ৮-১ গোলে পরাজিত করে।এ খেলায় আসলাম একাই পাঁচটি গোল করে।এর মাধ্যমে এ উপমহাদেশে ফুটবলে আসলামের নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৫-৮৬ সালে এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয় ।এ টুর্নামেন্টে তিনি আবাহনীর হয়ে নয়টি গোল করে, শ্রীলঙ্কার সন্ডার্স এসসি র প্রেমলালের সাথে যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা হন।

১৯৮৯-৯০ মৌসুমে, আসলাম ১১ গোল করেছিলেন এবং পাঁচবার সর্বোচ্চ স্কোরার হওয়ার নতুন রেকর্ড গড়েছিলেন। ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮-৮৯ মৌসুম পর্যন্ত, টানা পাঁচটি মৌসুমে প্রতিটি লীগে হ্যাটট্রিক করার বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি । ১৯৯১-৯২ মৌসুম পর্যন্ত টানা সাত মৌসুমে তিনি আবাহনীর হয়ে ১০৩ গোল করেন। আসলাম,তার ক্লাবের হয়ে ফেডারেশন কাপে ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি তিনটি লিগ ট্রফি জিতেছিলেন । ভারতের নাগজি ফুটবল টুর্নামেন্টের সাড়ে তিন দশকের ইতিহাসে , ১৯৮৯ সালে আবাহনী প্রথম বিদেশী দল হিসেবে টুর্নামেন্ট জিতেছিল। প্রথম ম্যাচে আবাহনী কেরালার ক্লাব চ্যাম্পিয়ন

ট্রাভাঙ্কোর টাইটানিয়ামের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছিল , খেলার ৮০তম মিনিটে রঞ্জিত সাহার থেকে বল পেয়ে গোল করেন আসলাম। ওই আসরে সেরা ফুটবলারের মুকুট উঠেছিল স্ট্রাইকার শেখ মোহাম্মদ আসলামের মাথায়। ফাইনালে তার গোলেই ভারতের সেসময়কার ফেডারেশন কাপ জয়ী সালগাওকারকে ১-০ গোলে পরাজিত করেছিলো আবহনী। শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সর্বোপরি পরিশ্রমের মাধ্যমে সবচেয়ে সফল ও সেরা স্ট্রাইকারে পরিণত হন আসলাম। তৈরি সুযোগ ও হাফ চান্সগুলো কাজে লাগিয়ে গোল করা, দুরূহ সব পজিশন ও অ্যাঙ্গেল থেকে অবিশ্বাস্য গোল, উঁচুতে বল চ্যালেঞ্জে তাঁর সঙ্গে ডিফেন্ডারদের পেরে না ওঠা, সাইড ভলি, ব্যাকভলি, বাইসাইকেল কিক, প্লেসিং শট, লং ও ক্লোজ রেঞ্জে তীব্র শটে গোল করা কিংবা প্রতিপক্ষের গোলরক্ষককে কাঁপিয়ে দিয়ে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন তিনি। ঢাকার মাঠে এতো গোলক্ষুধা আর কোনো স্ট্রাইকারের ছিল না। মাঠে নামার পরমুহূর্ত থেকেই গোল করার জন্য শিকারী বাঘের মত হণ্যে হয়ে উঠতেন। নানা কৌশলে আদায় করে নিতেন গোল।

ঘরোয়া আসরের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দাপটের সঙ্গে খেলেছেন আসলাম। তিনি ১৯৯১ সালে কলকাতা ফুটবল লিগে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলেছিলেন। ১৯৯১ সালে ডুরান্ড কাপে জর্জ টেলিগ্রাফ এসসি-র বিপক্ষে মাথায় আঘাতের কারণে তিনি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হন । তবে ক্লাবের হয়ে তার প্রথম গোলটিও একই ম্যাচে এসেছিল। ১৯৯১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কোলকাতার শীর্ষ ৩টি ও বাংলাদেশের শীর্ষ ৩টি ক্লাব নিয়ে আয়োজিত বিটিসি ক্লাব কাপে আবাহনী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রেও আসলামের কৃতিত্ব রয়েছে। কোলকাতা মোহামেডান এবং ইস্টবেঙ্গালের সঙ্গে তিনি একটি করে গোল করেন। ১৯৯১ সালে শ্রীলংকার কলম্বোয় অনুষ্ঠিত পঞ্চম সাফ গেমসে নেপালের সঙ্গে তিনি একটি গোল করেন। ১৯৮৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত অষ্টম এশিয়ান কাপ ফুটবলের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে তিনি বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন।বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ম্যাচে তিনি ইরানের সঙ্গে একটি গোল করেন। ১৯৯০ সালে চীনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়ে টানা চারটি এশিয়ান গেমসে অংশ নেয়ার গৌরব অর্জন করেন। আবাহনীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় ১৯৯৩ সালে তিনি মোহামেডানে যোগ দিয়ে ৭টি গোল করেন। ১৯৯৪ সালে পুনরায় আবাহনীতে ফিরে এসে আরো ১৬টি গোল করে ১৯৯৬ সালে ফুটবল থেকে অবসর নেন। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি উচ্চতার আসলাম ফুটবল ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে তিন শতাধিক গোল করেছেন। এর মধ্যে অসংখ্য গোল স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি ১৯৮৪ সালে এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ১৯৯৮ সালে তাকে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত করে। ২০০০ সালে আসলামকে দেয়া হয় জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার।

শেখ মোহাম্মদ আসলামের ফুটবল ক্যারিয়ার শুধু সাফল্যের গল্প নয়, এটি বাংলাদেশ ফুটবলের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তার শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, এবং ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা আমাদের প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। আজকের তরুণদের জন্য তার জীবনকাহিনি থেকে শেখার অনেক কিছু রয়েছে। ফুটবলের সেই সোনালি দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদেরকে এই কিংবদন্তিদের অবদান নতুন করে উদযাপন করতে হবে এবং দেশীয় ফুটবলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

#

পিআইডি ফিচার